Android Coding Bd

অষ্টম অধ্যায়

১৯৭০-এর নির্বাচন, অসহযোগ আন্দোলন ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ আইয়ুব খানের কাছে থেকে ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৮ নভেম্বর ১৯৬৯ জেনারেল ইয়াহিয়া ঘোষণা করেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে একটি ব্যবহারযোগ্য শাসনতন্ত্র দেয়া এবং যেসব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা গণমনকে আলোড়িত করেছে তার একটা সমাধান বের করা। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ইয়াহিয়া খান দুটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমত তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ব্যবস্থা বাতিল করে সেখানে চারটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয়ত 'এক ব্যক্তি এক ভোট'– এই নীতিতে ভোট হবে বলে ঘোষণা করেন। প্রথম সিদ্ধান্তটি পাকিস্তানের আঞ্চলিকতাবাদে বিশ্বাসী জনগণকে সন্তুষ্ট করে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবি মেনে নেয়া হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আরও কতগুলি বিষয়কে 'স্থিরীকৃত' বলে ঘোষণা করেন। এসব বিষয় হচ্ছে :

১. ফেডারেল পার্লামেন্টারি ধরনের সরকার।
২. প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারভিত্তিক প্রত্যক্ষ নির্বাচন।
৩. নাগরিকদের মৌলিক অধিকার দান এবং আইন-আদালতের মাধ্যমে এই অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা
৪. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং তাকে শাসনতন্ত্র রক্ষকের ভূমিকা দেয়া।
৫. যে আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য একটি ইসলামি ভাবাদর্শভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন।'

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর দেশে জাতীয় পরিষদের এবং ২২ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত জাতীয় পরিষদের কাজ হবে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। তিনি ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে উক্ত নির্বাচনের 'আইন কাঠামো আদেশ' (Legal frame work order)-এর মূলধারাগুলো ঘোষণা করেন। উক্ত আদেশে নির্বাচন ও জাতীয় পরিষদ গঠন ও এর কার্যাবলি কেমন হবে তা ঘোষণা করেন। আইনগত কাঠামো আদেশের বৈশিষ্ট্য ছিল নিম্নরূপ :

১. পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ৩১৩ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে। এর মধ্যে ১৩টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলারা সাধারণ আসনেও নির্বাচনের

Android Coding Bd

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারির লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রদেশসমূহের মধ্যে সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপে বন্টন করা হবে :

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	৭	
মোট	৩০০	১৩

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

২. প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট	৬০০	২১

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৩. জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রদেশের সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সেই প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন।

৪. জাতীয় পরিষদের কোনো আসন শূন্য হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে উক্ত শূন্য আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৫. ২৫ বৎসর বয়স্ক যে কোনো পাকিস্তানী নাগরিক যার নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তবে আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিকৃত মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি, কিংবা আদালত কর্তৃক দুই বছরের বেশি সময়ের সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সাজা ভোগের পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকলে, কিংবা ১৯৬৯ সালের ১ আগস্টের পর কোনো- না-কোনো সময় মন্ত্রী

Android Coding Bd

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন। ১৯৬১ সালের আদমশুমারির লোকসংখ্যা অনুযায়ী প্রদেশসমূহের মধ্যে সদস্য সংখ্যা নিম্নলিখিতরূপে বন্টন করা হবে :

Android Coding Bd

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
কেন্দ্র শাসিত উপজাতি এলাকা	৭	
মোট	৩০০	১৩

প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন।

২. প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে প্রাদেশিক পরিষদ থাকবে। প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা নিম্নরূপ :

প্রদেশের নাম	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২
মোট	৬০০	২১

Android Coding Bd

প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দও প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

৩. জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ স্ব-স্ব প্রদেশের সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সেই প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন।

৪. জাতীয় পরিষদের কোনো আসন শূন্য হলে তিন সপ্তাহের মধ্যে উক্ত শূন্য আসন নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করতে হবে।

৫. ২৫ বৎসর বয়স্ক যে কোনো পাকিস্তানী নাগরিক যার নাম ভোটার তালিকায় লিপিবদ্ধ আছে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন। তবে আদালত কর্তৃক ঘোষিত বিকৃত মস্তিষ্ক কোনো ব্যক্তি, কিংবা আদালত কর্তৃক দুই বছরের বেশি সময়ের সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি সাজা ভোগের পর পাঁচ বছর সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকলে, কিংবা ১৯৬৯ সালের ১ আগস্টের পর কোনো- না-কোনো সময় মন্ত্রী

Android Coding Bd

ছিলেন অথচ মন্ত্রিত্বের অবসানের পর দুই বছর অথবা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ২ বছরের কম কোনো নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকে এমন ব্যক্তি, কিংবা সরকারি লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি, কিংবা সরকারি চাকুরি থেকে বহিস্কৃত কোনো ব্যক্তি যদি বহিষ্কারের পর অন্তত পাঁচ বছর কিংবা কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের অনুমতি অনুসারে ৫ বছরের কম কোনো নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত না হয়ে থাকে, কিংবা পাকিস্তানের কোনো সরকারি চাকুরের স্বামী বা স্ত্রী হন, কিংবা তিনি আগে দেউলিয়া হন এবং আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর ১০ বছর অতিক্রান্ত না হয়ে থাকে, ইত্যাদি এমন সকল প্রার্থী নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৬. কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে জাতীয় পরিষদের ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রার্থী হতে পারবেন না। কেউ একই সঙ্গে কোনো পরিষদের একাধিক নির্বাচনী এলাকায় প্রার্থী হতে পারবেন তবে একাধিক আসনে নির্বাচিত হলে তাকে নির্বাচনের সরকারি ফলাফল ঘোষণার পনেরো দিনের মধ্যে একটি আসন রেখে বাকিগুলো ছেড়ে দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনি তা করতে ব্যর্থ হলে তার নির্বাচিত সবগুলি আসন শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

৭. কোনো সাংসদ স্পিকার বরাবর স্বহস্তে লিখিত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন। কোনো সদস্য স্পিকারের নিকট থেকে ছুটি না নিয়ে একাদিক্রমে পনেরোটি কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হয়ে যাবে। কোনো সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের প্রথম অধিবেশনের সাত দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হলে তার সদস্যপদ শূন্য বলে গণ্য হবে। তবে স্পিকার নির্বাচনে বিলম্ব ঘটলে উপরিউক্ত সময়কাল বাড়ানো যাবে।

৮. জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্ট তার পছন্দমতো দিন, সময় ও স্থানে জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করবেন। প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে ভাষণ দিতে পারবেন।

৯. জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করবেন। স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকার পদ শূন্য হলে জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ অন্য আরেকজন সদস্যকে স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত করবেন। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত না-হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনার জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন। স্পিকারের পদ শূন্য হলে ডেপুটি স্পিকার কিংবা ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য হলে উক্ত পদ পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত কমিশনার স্পিকার/ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন। স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে ডেপুটি স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার অনুপস্থিত থাকলে পরিষদ-সদস্যদের কোনো (পরিষদের কার্যবিধান অনুযায়ী) একজন সদস্য স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন। স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার পরিষদের সদস্যপদ হারালে কিংবা জাতীয় পরিষদ থেকে

Android Coding Bd

পদত্যাগ করলে কিংবা ২/৩ অংশ পরিষদ-সদস্যদের আস্থা হারালে তাঁর পদ শূন্য হয়ে যাবে।

১০. জাতীয় পরিষদের কোনো অধিবেশনে ১০০ জনের কম সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকলে অধিবেশনের কাজ চালানো যাবে না, অধিবেশন চলতে চলতে সদস্য সংখ্যা ১০০ জনের কম হয়েছে বলে কোনো সদস্য স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে কোরাম পূর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন স্থগিত রাখবেন কিংবা মুলতবি করে দিবেন।

১১. সদস্যরা পরিষদে বাংলা, উর্দু কিংবা ইংরেজিতে বক্তৃতা দিবেন। পরিষদের কার্যবিবরণীর সরকারি রেকর্ড উর্দু, বাংলা এবং ইংরেজিতে রক্ষিত হবে।

১২. শাসনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আইনকাঠামো আদেশে কতকগুলো মূলনীতি উল্লেখ করে দেয়া হয়। এসব মূলনীতির মধ্যে ছিল :

(১) "জনসংখ্যা এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর পর ফেডারেল ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহের অবাধ প্রত্যক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ অনুসরণের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।"

(২) "নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বিধিবদ্ধ করা হবে এবং এই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।"

(৩) "মামলা-মোকদ্দমার বিচার এবং মৌলিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা দেয়া হবে।"

(৪) "আইন তৈরি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সব রকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করবেন কিন্তু একই সঙ্গে ফেডারেল সরকার ও বাইরের ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখন্ডতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক ক্ষমতা পাবেন।"

(৫) "নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে যেন :

(ক) পাকিস্তানের সব এলাকার জনগণ সব রকম জাতীয় প্রচেষ্টায় পুরোপুরি অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। এবং

(খ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে এবং প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন এলাকার মধ্যে অর্থনৈতিক এবং অন্য সব রকম বৈষম্য দূর করা হয়।"

(৬) "শাসনতন্ত্রের উপক্রমণিকায় এই মর্মে ঘোষণা থাকতে হবে যে– (ক) পাকিস্তানের মুসলমানরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পর্যায়ে, পবিত্র কোরান ও সুন্না মোতাবেক ইসলামের শিক্ষা অনুসারে তাদের জীবন গড়ে তুলতে পারেন। এবং

Android Coding Bd

Android Coding Bd

(খ) সংখ্যালঘুরা অবাধে তাদের ধর্ম-পালন এবং পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সব রকম অধিকার, সুযোগ-সুবিধা এবং নিরাপত্তা ভোগ করতে পারেন।"

১৩. ইয়াহিয়া খান ঘোষিত 'আইন কাঠামো আদেশ'-এর উপক্রমণিকায় উল্লেখ করা হয় যে এই আদেশের সঙ্গে সংগতি রেখে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র তৈরি করতে হবে। আদেশের ১৪(১) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, জাতীয় পরিষদ সাধারণ নির্বাচন শেষ হওয়ার পর পকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য প্রেসিডেন্ট তার বিবেচনামতো উপযুক্ত তারিখ, সময় ও স্থানে পরিষদের অধিবেশন ডাকবেন। জাতীয় পরিষদ তার প্রথম অধিবেশনের সময় থেকে ১২০ দিনের মধ্যে 'শাসনতন্ত্র বিল' নামক একটি বিলের আকারে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন এবং তা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। জাতীয় পরিষদে পাসকৃত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদনের জন্য পেশ করা হবে। উক্ত বিলে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না-দেয়া পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ আইনসভা হিসেবে তার কাজ শুরু করতে পারবেন না। উক্ত বিল প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। শাসনতন্ত্র বিলে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না-দেয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদগুলোর অধিবেশন ডাকা হবে না।

আইন কাঠামো আদেশের সংশোধনী

আইন কাঠামো আদেশের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে ব্যাখা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা প্রমাণ করবেন প্রেসিডেন্ট। এতদসংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত গণ্য হবে এবং তাকে কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। প্রেসিডেন্ট কেবল এই আদেশের যে কোনো ধারা সংশোধন করতে পারবেন। এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

আইন কাঠামো আদেশের প্রতিক্রিয়া

এই আদেশের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে জাতীয় সংসদের রূপরেখা ঘোষণা করেন তা ছিল এক দুর্বল জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল প্রেসিডেন্টের ইচ্ছের ওপর। একশো বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন ও তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি নিতে ব্যর্থ হলে যে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হয়ে যাবে সে-সংসদকে সার্বভৌম সংসদ বলা যায় না। বস্তুত আইয়ুব খানের ন্যায় ইয়াহিয়া খানও সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন না। ইয়াহিয়া খানের বিশ্বাস ছিল যে নির্বাচনে কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সক্ষম হবে না। সুতরাং একশো বিশ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন কোনো দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই বিশ্বাস থেকেই তিনি আইন কাঠামো আদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দিয়ে একশো বিশ দিনের বাধ্যবাধকতা জুড়ে দেন। স্বভাবতই আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (উভয় গ্রুপ)সহ অনান্য গণতন্ত্রমনা দলসমূহ আইন কাঠামো আদেশ থেকে অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাদ দেয়ার দাবি জানান। তারা বিশেষ করে জাতীয় সংসদের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্নকারী ধারা ও জাতীয় সংসদ-সদস্যদের ক্ষমতা সংকোচন করে এমন ধারাসমূহের বিরোধিতা করেন। আইন

Android Coding Bd

কাঠামো আদেশ থেকে অগণতান্ত্রিক ধারা ও সকল [illegible] ন্যাপ (ওয়ালী) ২৬ এপ্রিল (১৯৭০) দাবি দিবস পালন করে। পক্ষান্তরে সকল ডানপন্থী দলসমূহ উক্ত আইন কাঠামো আদেশ মেনে নেয়। শেষ পর্যন্ত বিরোধীদলসমূহের কোনো দাবির প্রতি ইয়াহিয়া খান কর্ণপাত করেননি। তিনি ঘোষণা করেন যে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা সংকোচন করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। জাতীয় সংসদ যে সংবিধান প্রণয়ন করবে তাতে প্রেসিডেন্টের সম্মতি দেয়ার যে-বিধান আইন কাঠামো আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে তাও চিরাচরিত প্রথা মাত্র।

ইয়াহিয়া খান ঘোষিত আইন কাঠামো আদেশের বিরূপ সমালোচনা করলেও ভাসানী ন্যাপ বাদে অন্য দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনে ব্যাপক জনসমর্থন বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। তিনি নির্বাচনকে ৬ দফা ও ১১ দফা দাবিসমূহের ওপর 'রেফারেন্ডাম' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি নির্বাচনকে সকল শোষণ ও বঞ্চনার প্রতিবাদ করার সুযোগ বলে মনে করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আসন্ন নির্বাচন হচ্ছে ব্যালটের মাধ্যমে পূর্ববাংলার জনগণের দাবি আদায়ের সর্বশেষ সংগ্রাম। ন্যাপ (ওয়ালী) নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সংসদ প্রতিষ্ঠা করে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের দাবি আদায় করতে হবে। ন্যাপ-নেতা ওয়ালী খান জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কিন্তু মওলানা ভাসানী নির্বাচনের ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রদান করতে থাকেন। তিনি একদিকে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, আবার 'ভোটের আগে ভাত চাই' স্লোগানও উত্থাপন করেন। তিনি নির্বাচনে তার দলের অংশগ্রহণের ব্যাপারে দুই পূর্বশর্ত আরোপ করেন : এক. জাতীয় সংসদে কৃষক ও শ্রমিকদের জন্য আসন নির্দিষ্ট করতে হবে; দুই. নির্বাচনের পূর্বেই ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের আলোকে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে। শেষপর্যন্ত মওলানা ভাসানীর দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। 'পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ'ও এই নির্বাচন বয়কট করে।

নির্বাচন

পাকিস্তানের প্রায় এগারোটি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। তবে প্রায় সকল প্রধান দলসমূহ, যেগুলি সে-সময় শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত হতো– সেগুলো মূলত ছিল আঞ্চলিক। যেমন, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে এর কোনো সমর্থন ছিল না। তদনুরূপ ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টির জনসমর্থন ছিল সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশদ্বয়ে, অন্যত্র তার সমর্থন ছিল না। ওয়ালী ন্যাপের সমর্থন বেশি ছিল বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে। অপরদিকে সর্বপাকিস্তান ভিত্তিক যে-দলগুলি তখন ছিল সেগুলি কেবল নামেই ছিল সর্বপাকিস্তানী, বাস্তবে কোনো প্রদেশেই এগুলির কোনো ব্যাপক জনসমর্থন ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তানে যে-দলগুলি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে সেগুলি হচ্ছে : আওয়ামী

Android Coding Bd

লীগ, ন্যাপ (ওয়ালী), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, জামায়াত-ই-ইসলামী প্রভৃতি।

১৯৭০ সালের ১ জানুয়ারি সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ফলে সেদিন থেকেই নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু হয়।

বিভিন্ন দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ ছয়দফাকে নির্বাচনী মেনিফেস্টো হিসেবে ঘোষণা করে। তারা নির্বাচনকে ছয়দফা ও এগারো দফার প্রশ্নে একটি গণভোট বলে অভিহিত করেন। নির্বাচনে জয়লাভ করলে ছয়দফার ভিত্তিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ 'জয় বাংলা' স্লোগানকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করে এবং এই স্লোগানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। ১ ডিসেম্বর ১৯৭০ রেডিও-টিভিতে শেখ মুজিব যে নির্বাচনী ভাষণ দেন তাতে তার দলের নির্বাচনী মেনিফেস্টো সংক্ষেপে নিম্নরূপ তুলে ধরেন :

...জনগণের ত্যাগ ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফল হচ্ছে এই সাধারণ নির্বাচন। সারা দেশ ও দেশের মানুষকে তীব্র সংকট ও দুর্গতি থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করার সুযোগ এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করা যেতে পারে। ...স্বাধীনতার তেইশ বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের মূল দায়িত্ব এবং অধিকার সর্বপ্রথম এবারই জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা লাভ করেছে। তাই এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। ...ভোটাধিকারের নির্ভুল প্রয়োগের মাধ্যমে সেই মহাসুযোগ ও দায়িত্ব যদি আমরা কুচক্রীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি তাহলে কৃষক-শ্রমিক সর্বহারা মানুষের দুঃখ মোচন এবং বাঙলার মুক্তিসনদ ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়িত করা যাবে।

আইয়ুব আমলে ঘোষিত ছয়দফা কর্মসূচি ইতোমধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বস্তুত ছয়দফা ও এগারো দফার আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুবের পতন ঘটে। এখন নির্বাচনের বিজয় অর্জনের মাধ্যমে ছয়দফা দাবির বাস্তবায়নের সুযোগ বাঙালি জনগোষ্ঠীর সামনে উপস্থিত হয়। শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, ক্ষমতায় বসার জন্য নির্বাচনে জয়লাভ তার উদ্দেশ্য নয়, বাঙালির শোষণ ও বঞ্চনার অবসানের জন্যই নির্বাচনে জয়লাভ অত্যাবশ্যক। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, বাঙালিরা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ। সুতরাং আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপনিবেশ হয়ে থাকতে চাই না। আমাদেরকে স্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ন্যাপ (ওয়ালী)

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)-এর পূর্ব পাকিস্তান শাখা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে অগ্রাধিকার দিলেও ক্ষমতার বন্টন প্রশ্নে আওয়ামী লীগের ছয়দফা থেকে তাদের দাবি অনেক নমনীয় ছিল। ন্যাপ (ওয়ালী) কেন্দ্রের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও মুদ্রা রেখে বাকি বিষয়গুলি প্রদেশের হাতে দেয়ার পক্ষপাতী ছিল। আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ এই যে, এই দলটি বাঙালি বুর্জোয়াদের দল এবং তারা পশ্চিম পাকিস্তানী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর

Android Coding Bd

একচেটিয়া সুযোগ সুবিধার অংশীদারিত্ব চায়। ন্যাপ (ওয়ালী) সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। তবে তা অর্জনের লক্ষ্যে তারা একটি গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের নির্বাচনী স্লোগান ছিল : 'বাংলার কৃষক-শ্রমিক জাগো'। ইসলামি দলগুলির সমালোচনা করে ন্যাপ (ওয়ালী) বলে যে, তারা ধর্মের নামে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলাম ব্যবহার করছে। প্রদেশের প্রতিক্রিয়াশীল ইসলামি দলগুলোর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও দুই ন্যাপের নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠনের জন্য ন্যাপ (ওয়ালী) উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু আওয়ামী লীগ এ ধরনের জোট গঠনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে ন্যাপের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।

ন্যাপ (ভাসানী)

নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে কি করবে না এই নিয়ে ভাসানী ন্যাপ বরাবরই দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিল। এই দলটি বিপ্লবের মাধ্যমে জনগণের অধিকার আদায়ের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলে এই দল নির্বাচনের পূর্বেই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং জাতীয় সংসদের কৃষক ও শ্রমিকের জন্য আসন বরাদ্দ প্রভৃতি পূর্বশর্ত আরোপ করে। অবশেষে ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় যে ভয়াবহ সাইক্লোন সংঘটিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন স্থগিত/বাতিল রাখার দাবি পেশ করেন।

পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)

পিডিপি কেন্দ্রকে শক্তিশালী রেখে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, অর্থ, মুদ্রা, আন্তঃপ্রাদেশিক ও বৈদেশিক বাণিজ্য এবং যোগাযোগ বিষয়ক ক্ষমতা অর্পণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। পার্টি মেনিফেস্টোতে দাবি করা হয় যে, দুই প্রদেশের মধ্যে সকল ধরনের বৈষম্য যেন দশ বছরে দূর করা যায় সে লক্ষ্যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সংবিধানে উল্লেখ করা উচিত। এই দল বিশ্বাস করত যে কেবলমাত্র ধর্মীয় বন্ধনে পাকিস্তানের উভয় অংশের ঐক্য অটুট রাখা সম্ভব। পিডিপি নেতা নূরুল আমিন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতাবাদিতার অভিযোগ উত্থাপন করে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের ছয়দফা দাবিকে নির্বাচনী রেফারেন্ডাম হিসেবে গণ্য করায় আওয়ামী লীগ যদি পূর্ব পাকিস্তানে জনসমর্থন অর্জন সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানে জনসমর্থন অর্জন করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের ঐক্য অটুট রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

জামায়াতে ইসলামি

এই দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা অপরাপর ইসলামি দল এবং মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ উত্থাপন করে যে ঐ সকল দল ইসলামকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছে। জামায়াতে ইসলামির মতে পার্লামেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত ভুল নীতির কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বেড়েছে। জামায়াত ১৯৫৬ সালের সংবিধানের কিছু পরিবর্তন করে উক্ত সংবিধান পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবির

Android Coding Bd

প্রশ্নে জামায়াতের অভিমত ছিল যে বিভিন্ন প্রদেশকে এতটুকু স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা উচিত যা দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবে না। জামায়াত আওয়ামী লীগের ছয়দফার সমালোচনা করে বলে যে ছয়দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করবে। পূর্ব পাকিস্তান জামাতের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের ছয়দফা কর্মসূচির কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পাকিস্তানের অখন্ডতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। জামায়াত দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচির দ্বারা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র ইসলামী অর্থনীতিই পারে পাকিস্তানের সকল সমস্যার সমাধান করতে।

কাউন্সিল মুসলিম লীগ

কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান পাঞ্জাবের মিঞা মমতাজ দৌলতানা পাকিস্তানে ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তিনি আওয়ামী লীগের ছয়দফার কঠোর সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, ছয়দফার বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল ক্ষমতাহীন ও অকার্যকর হয়ে পড়বে। এই দল যে-কোনো ধরনের সমাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। দলের নেতৃবৃন্দ বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির কঠোর সমালোচনা করে।

কনভেনশন মুসলিম লীগ

কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তারা পাকিস্তানে ইসলামি আদর্শ অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। অন্য দুই মুসলিম লীগের ন্যায় এই দলও ভারত-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিল। এই দলের নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী সমাজতন্ত্র ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন।

কাইয়ুম মুসলিম লীগ

এই দলও ভারত-বিরোধী ছিল। দলের নেতৃবৃন্দ শেখ মুজিবুর রহমানকে এই বলে অভিযুক্ত করেন যে, তিনি ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে পাকিস্তানকে খন্ডিত করতে চান।

এই দল শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষপাতী ছিল। দেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাই দলের লক্ষ্য বলে প্রচার করা হয়।

উপরে উল্লেখিত দলসমূহের কর্মসূচি বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন রাজনৈতিক দলগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়– প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে বিশ্বাসী দল, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দল ও ডানপন্থী দলসমূহ যারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইসলামী ভাবধারার শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিল।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় পরিষদে দলভিত্তিক প্রার্থী সংখ্যা

১৯৭০-এর নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে আসনসংখ্যা ছিল সাধারণ ৩০০ এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৩টি। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল সাধারণ ১৬২ এবং মহিলা ৭টি। ১৬২টি আসনের জন্য দলভিত্তিক প্রার্থীসংখ্যা ছিল

Android Coding Bd

নিম্নরূপ :

দল	নির্বাচনী প্রতীক	প্রার্থী সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	নৌকা	১৬২
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	সাইকেল	৯৩
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	বাঘ	৬৫
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	হারিকেন	৫০
জামায়াতে ইসলামি	দাঁড়িপাল্লা	৬৯
জমিয়াতুল উলেমা ও নেজামে ইসলামি	বই	৪৫
জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম	খেজুর গাছ	১৩
শর্ষিনার পীরের ইসলামিক গণতন্ত্রী দল	গাভী	৫
পাকিস্তান দরদী সংঘ	গরুর গাড়ি	১
কৃষক-শ্রমিক পার্টি	হুঁকা	৩
ন্যাপ (ভাসানী)	ধানের শীষ	১৫
ন্যাপ (মোজাফফর)	কুঁড়েঘর	৩৬
পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ	লাঙ্গল	১৩
বেলুচিস্তান যুক্তফ্রন্ট	চেয়ার	১
পিডিপি	ছাতা	৮১
জাতীয় গণমুক্তি দল (সংখ্যালঘু)	মোমবাতি	৪
জাতীয় কংগ্রেস (সংখ্যালঘু)	কলম	৪
স্বতন্ত্র প্রার্থী		১০৯
	মোট	৭৬৯ জন

উপরের পরিসংখ্যান থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, এক আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য আর কোনো দলই পূর্ব পাকিস্তানে সবকয়টি আসনে প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেনি। আইয়ুবের কনভেনশন মুসলিম লীগ সবকয়টি আসনে প্রার্থী দিতে না পারলেও দ্বিতীয় বৃহত্তম দল ছিল। বামপন্থী দলগুলোর বিষয়ে ইত্তেফাক মন্তব্য করেছে যে:

'সমাজতন্ত্রী শিবিরে ব্যাহত বিরোধ পরিদৃষ্ট হইলেও ভিতরে ভিতরে তাহাদের মধ্যে যে একটি নির্বাচনী সমঝোতা আছে... কোনো আসনেই এক ন্যাপ অপর ন্যাপের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়নি।

ইসলামপন্থী দলগুলির বিষয়ে ইত্তেফাকের মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ:

ইসলাম-পছন্দ শিবির পাঁচটি দলে বিভক্ত। মুখে সকলেরই ইসলামের বাণী ও বুলি অথচ কেহ 'দাঁড়িপাল্লা', কেহ 'বই', কেহ 'খেজুর গাছ', কেহ 'গাভী', কেহ 'গরুর গাড়ি প্রতীক লইয়া নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে। ইসলামের প্রশ্নে প্রতিপক্ষের বক্তব্যে তাহারা যত সমালোচনাই করুন না কেন, তাহাদের এই বিভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনী প্রতীকই

Android Coding Bd

প্রমাণ করিয়াছে যে, রাজনীতির সহিত ধর্মকে জড়িত করা চলে না। করিলে ন্যায় ও সত্যের, শান্তি ও সুন্দরের ধর্ম ইসলাম বিতর্কের বস্তুতেই পরিণত হয়।

নির্বাচনে পাকিস্তানে মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল ৫ কোটি ৬৪ লাখের উপর, তন্মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ৩ কোটি ২২ লক্ষ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২ কোটি ৫২ লক্ষ (মোট জনসংখ্যা ১১ কোটি ৫০ লক্ষ)। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ আসনসমূহে সরাসরি বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রার্থীরা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরে নির্বাচিত হন।

পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। পাকিস্তান ন্যাশনাল লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেও এবং ভাসানী ন্যাপ নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করলেও ব্যালট পেপারে তাদের নাম ছিল। নির্বাচনে মওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ. এস. এম, সোলায়মান ভোট দেননি।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফল এবং তা মেনে নিতে কেন্দ্রের অস্বীকৃতি

১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেপ্টেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবল বন্যা হয়। বন্যার জন্য ভোটারদের ভোট দানে অসুবিধার কথা বিবেচনা করে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঠিক করেন ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ নির্দিষ্ট হয় ১৭ ডিসেম্বর। কিন্তু ১৯৭০ সালে ১২ নভেম্বর দক্ষিণ বাংলায় অনুষ্ঠিত এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় প্রায় দুই লক্ষ লোকের জীবন কেড়ে নেয়। অসংখ্য বাড়িঘর ধ্বংস হয়। ঘূর্ণিঝড় আক্রান্ত এলাকা এক ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়। এই বিপর্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সকল দল নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার দাবি জানান। কিন্তু আওয়ামী লীগ তার দৃঢ় প্রতিবাদ করে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন :

If the polls are frustrated, the people of Bangladesh will owe it to the million who have died to make the supreme sacrifice of another million lives, if need be, so that we can live as a free people and so that Bangladesh can be the master of its own destiny. (Morning News. Nov. 27. 1970).

এই ঘূর্ণিঝড় বাঙালিদের প্রতি পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর অবহেলা ও উপেক্ষার মনোভাব নতুন করে প্রমাণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই সুযোগটি গ্রহণ করেন। তিনি দুর্গতদের প্রতি পাকিস্তান সরকারের অবজ্ঞা প্রদর্শনের কঠোর সমালোচনা করে বলেন।

A massive rescues and relief operation, if launched within 24 hours of the occurrence, could have saved thousands of lives. Thousand of survivors could have been saved from death due to starvation, exposure

Android Coding Bd

and lack of medical attention. Had the navy rushed into the area it could have rescued thousand who had been swept into the sea. The failure to launch such a relief and rescues operation is unforgivable.... we are confirmed today in our convention that if we are to save the people of Bangladesh from the ravages of nature, as of their fellowmen we must attain full /regional autonomy of the basis of the 6 point/11 point formula.

নির্বাচনের ফলাফল

জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল প্রদেশ এবং দলভিত্তিক নিম্নরূপ:

দলের নাম	প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরসংখ্যা	প্রদেশ অনুসারে ফলাফল							মোট মহিলাসহ
		পূর্ব পাক	পাঞ্জাব	সিন্ধু	উ.প. সী.প্রদ	বেলু চিস্তান	উপজাতির এলাকা	মহিলা	
আওয়ামী লীগ	১৬২	১৬০	×	×	×	×	×	৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	১২২	×	৬৪	১৮	১	×	×	৫	৮৮
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	১৩২	×	১	১	৭	×	×	×	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	১১৯	×	৭	×	×	×	×	×	৭
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	৯৩	×	×	×	৬	১	×	×	৭
মারকাজ-ই-জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	?	×	৪	৩	×	×	×	×	৭
ন্যাপ (ওয়ালী)	৬১	×	×	×	৩	৩	×	১	৭
জামায়াতে ইসলাম	২০০	×	১	২	১	×	×	×	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	১২৪	×	২	×	×	×	×	×	২
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	১০৮	১	×	×	×	×	×	×	১
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৩০০	১	৩	৩	×	×	৭	×	১৪
মোট		১৬২	৮২	২৭	১৮	৪	৭	১৩	৩১৩

জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে দুটি রাজনৈতিক দল প্রধান হয়ে দেখা দেয়। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ লাভ করে। বাকি ২টি আসনের ১টি পায় পিডিপি নেতা নূরুল আমিন, অপরটি একজন স্বতন্ত্র সদস্য। ১০দিন পর অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। অপরপক্ষে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানে ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে।

Android Coding Bd

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট আসন
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮
পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি	২	×	২
পাকিস্তান পিপলস পার্টি	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	×	×	×
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	×	×	×
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	×	১
জামায়াতে ইসলামি	×	×	×
নেজামে ইসলামি	×	×	×
জামায়াত-উল-উলামায়ে ইসলাম	×	×	×
মারকাজে আহলে হাদীস	×	×	×
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (হাজারী)	×	×	×
জামায়েত-ই-উলামায়ে ইসলাম (নূরানী)	×	×	×
স্বতন্ত্র প্রার্থী	৭	×	৭
মোট	৩০০	১০	৩১০

Android Coding Bd

সংগঠনের দিক থেকে আওয়ামী লীগ ও পিপিপি-উভয়েই ছিল আঞ্চলিক। আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিরা সকলেই পূর্ব পাকিস্তানী এবং পিপিপি'র সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সবগুলি আসন লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তারা কোনো আসন পায়নি। পক্ষান্তরে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থী মনোনয়ন দিতে না পারলেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের প্রতি এই বিপুল রায় ছিল প্রকারান্তরে ৬-দফা কর্মসূচির প্রতি গণরায়। এই গণরায় ছিল পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের জন্য পূর্ববাংলাবাসীর ম্যান্ডেট স্বরূপ। আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের দেয়া এই ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে জনগণ অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহের কর্মসূচিকে প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তানে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে–ডানপন্থী দলসমূহের এই চিরাচরিত ভাঁওতাবাজিকে পূর্ববাংলার জনগণ প্রত্যাখ্যান করেন।

দুই প্রদেশে দুটি দল প্রাধান্য লাভ করায় পাকিস্তানে নির্বাচনোত্তর অবস্থা জটিল হয়ে পড়ে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়া মাত্র শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন :

> I warmly thank the people for having given a historic verdict in favour of our Six-point Programme. We pledge to implement this verdict. There can be no constitution except one which is based on the Six-point Programme.

Android Coding Bd

নির্বাচনী ফলাফলের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ ও ভুট্টোর পি. পি. পি. এর প্রতিক্রিয়া

শেখ মুজিবের বিবৃতির পাল্টা জবাবে ভুট্টো বলেন, তার দলের সহযোগিতা ছাড়া কেন্দ্রে কোনো সরকার প্রতিষ্ঠা কিংবা সংবিধান প্রণয়ন করা সম্ভব হবে না। তিনি আরও বলেন যে, পিপলস পার্টি পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় এই দুই প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব অবশ্য থাকতে হবে। ভুট্টোর কথার পাল্টা জবাব দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন যে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে এবং সংবিধান প্রণয়ন করতেও সে সক্ষম। তিনি বলেন যে, যেহেতু এক ব্যক্তি এক ভোট ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকারের পাঞ্জাব ও সিন্ধুর প্রতিনিধিত্ব আবশ্যক– ভুট্টোর এই দাবি ঠিক নিয়। ভুট্টো বলেন যে, জাতীয় সংহতি অক্ষুণ্ন রাখার পর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে। ভুট্টো দাবি করেন যে, নির্বাচনের পূর্বে ঘোষিত আইনকাঠামো আদেশে ক্ষমতার বন্টন সম্পর্কে যা উল্লেখিত আছে তারই আলোকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে। উক্ত আদেশে বলা হয়েছিল:

> আইন তৈরি সংক্রান্ত, প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতাসহ সবরকম ক্ষমতাই ফেডারেল সরকার এবং প্রদেশগুলোর মধ্যে এমনভাবে ভাগ করা হবে যে, প্রদেশগুলো সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ সর্বাধিক পরিমাণ আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশাসনিক এবং আর্থিক ক্ষমতা ভোগ করবেন। কিন্তু একইসঙ্গে ফেডারেল সরকার ও বাইরের ও আভ্যন্তরীণ বিষয়াদিতে তার দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ড তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পর্যাপ্ত আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং আর্থিক ক্ষমতা পাবেন।

এইভাবে পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে দুই মেরুতে অবস্থান গ্রহণ করে। আওয়ামী লীগ ছয়দফার ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি অক্ষুণ্ন রাখে। অপরদিকে পিপিপি সহ অন্যান্য ডানপন্থী দলসমূহ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করতে থাকে। জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দের শপথ গ্রহণ উপলক্ষে ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত এক র‍্যালি সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন;

সংবিধান প্রণয়ন করতে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের সমর্থন ও সহযোগিতা চাই। কিন্তু মৌলিক নীতির প্রশ্নে কোনো আপোষ নেই।... আমরা অনেক কষ্ট ভোগ করছি, অবিচার সহ্য করছি। এর কী জ্বালা তা আমরা বুঝি। সুতরাং আমরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতি ন্যায়বিচার করব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ছয়দফা ও এগারো দফার প্রতি ম্যান্ডেট ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন যে, ৬-দফা এখন জনসাধারণের সম্পত্তি এবং তা রদবদল করা সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগ এখন এর কোনো অংশ সংশোধন করতে পারে না। কেউই আমাদেরকে ছয়দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের কাজ থেকে বিরত করতে পারবে না।

Android Coding Bd

সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ে আপোষ প্রচেষ্টা

১৯৭১ সালের মধ্য-জানুয়ারিতে ইয়াহিয়া খান ঢাকা এসে তিন দিন ধরে শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন ও ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে আলোচনা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ২৭ থেকে ২৯ জানুয়ারি ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন এবং আলোচনা শেষে ছয়দফার কেবলমাত্র প্রথম ও ষষ্ঠ দফাদ্বয় মেনে নিতে সম্মত হন। ফেব্রুয়ারির ১৪ তারিখে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ঢাকায় বসবে ৩ মার্চ, ১৯৭১। ভুট্টো তার মতামত গ্রহণের অঙ্গীকার না দিলে উক্ত অধিবেশন বয়কটের হুমকি দেন। তিনি বলেন যে, তার দল কেবলমাত্র অন্য একটি দল কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রণীত একটি সংবিধানে সম্মতি দেয়ার জন্য ঢাকা যেতে পারে না।

ভুট্টোর এই বক্তব্য বেশ সমালোচিত হয়। পাকিস্তানে রাজনৈতিক সংকট অত্যাসন্ন বলে সংবাদপত্রগুলোতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট করে ঘোষণা করেন : 'আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। যদি পশ্চিম পাকিস্তান তার দলের ৬ দফা কর্মসূচি পুরোপুরি মেনে না নেয়, তাহলে তিনি একাই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। কিন্তু ইয়াহিয়া ভুট্টোর দাবির নিকট মাথা নত করেন। তিনি ১ মার্চ ১৯৭১ এক ঘোষণা জারির মাধ্যমে ৩ মার্চ (১৯৭১) অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তিনি ঘোষণায় বলেন :

> সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান দলটি এবং অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করার ইচ্ছে নেই বলে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে আবার হিন্দুস্থান যে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তা গোটা ব্যাপারটাকে আরো জটিল করে তুলেছে। সেজন্য আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

খ. অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ, অপারেশন সার্চলাইট

ইয়াহিয়ার এই ঘোষণার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ (১৯৭১) ঢাকায় এবং তার পরদিন সারা প্রদেশে হরতাল ডাকেন। ১৯৭১ সালের ২ মার্চ এক বিবৃতিতে বঙ্গবন্ধু বলেন :

> এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারি কর্মচারীসহ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি বাঙালির পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে– গণবিরোধী শক্তির সঙ্গে সহযোগিতা না-করা। অধিকন্তু তাদের উচিত সবটুকু শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দেয়া।

২ এবং ৩ মার্চ হরতালের ফলে সকল সরকারি কর্মকাণ্ড অচল হয়ে পড়ে। প্রদেশটির যোগাযোগ সারা বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কোনো কোনো ছাত্র এবং শ্রমিক সংগঠন স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি করেন। 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' ৩ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে।

Android Coding Bd

প্রস্তাবে বলা হয় :

> ...এই সভা পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক-শ্রমিক কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে। এই সভা স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ণ আস্থা রাখিয়া তাহার সকল সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে। এই সভা দলমত নির্বিশেষে বাঙলার প্রতিটি নর-নারীকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার আহ্বান জানাইতেছে।

সভায় 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণা ও কর্মসূচি' শীর্ষক একটি ইশতেহার প্রচার করা হয় (ইশতেহার নং-এক)– এতে বলা হয় যে, তিনটি লক্ষ্য অর্জন করার জন্য স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠন করা হবে। লক্ষ্যগুলো হলো–

> 'স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে পৃথিবীর বুকে একটি বলিষ্ঠ বাঙালি জাতি সৃষ্টি ও বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
>
> স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে অঞ্চলে অঞ্চলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য নিরসনকল্পে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে কৃষক-শ্রমিক রাজ্য কায়েম করতে হবে।
>
> স্বাধীন ও সার্বভৌম 'বাঙলাদেশ' গঠন করে ব্যক্তি, বাক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ নির্ভেজাল গণতন্ত্র কায়েম করতে হবে।
>
> প্রস্তাবে বাংলাদেশের কথিত স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার জন্য নিম্নলিখিত কর্মপন্থা গ্রহণ করার কথা বলা হয় :
>
> ক. বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম, মহল্লা, থানা, মহকুমা, শহর ও জেলায় 'স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করতে হবে।
>
> খ. সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা ও তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।
>
> গ. শ্রমিক এলাকায় শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সুসংগঠিত করে গ্রামে গ্রামে, এলাকায় এলাকায় মুক্তিবাহিনী গঠন করতে হবে।
>
> ঘ. হিন্দু-মুসলমান ও বাঙালি-অবাঙালি সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিহার করতে হবে এবং সম্প্রীতি বজায় রাখতে হবে।
>
> ঙ. স্বাধীনতা সংগ্রামকে সুশৃঙ্খলার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং লুটতরাজসহ সকল প্রকার সমাজবিরোধী ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।

উক্ত ইশতেহারে উল্লেখ করা হয় যে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক। ইশতেহারে নিম্নলিখিত স্লোগান উচ্চারণের আহ্বান জানানো হয় :

> 'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ-দীর্ঘজীবী হউক; স্বাধীন কর স্বাধীন কর–

Android Coding Bd

বাংলাদেশ স্বাধীন কর; স্বাধীন বাংলার মহান নেতা– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব; গ্রামে গ্রামে দুর্গ কর–মুক্তিবাহিনী গঠন কর; বীর বাঙালি অস্ত্র ধর– বাংলাদেশ স্বাধীন কর; মুক্তি যদি পেতে চাও–বাঙালিরা এক হও।'

২ মার্চ পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশে প্রচারিত এক খোলা চিঠিতে সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো হয়। খোলা চিঠিটির বক্তব্য ছিল নিম্নরূপ :

> আপনার আপনার পার্টির ছয়দফা সংগ্রামের রক্তাক্ত ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, ছয়দফার অর্থনৈতিক দাবিসমূহ বাস্তবায়ন সম্ভব সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন, মুক্ত ও স্বাধীন কর। আপনাকে ও আপনার পার্টিকে পূর্ববাংলার সাত কোটি জনসাধারণ ভোট প্রদান করেছে পূর্ববাংলার উপরস্থ পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকগোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের অবসান করে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলা প্রজাতন্ত্র কায়েমের জন্য।

পূর্ববাংলার জনগণের এ আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন আপনার প্রতি ও আওয়ামী লীগের প্রতি নিম্নলিখিত প্রস্তাবাবলি পেশ করেছে :

> পূর্ববাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে এবং সংখ্যাগুরু জাতীয় পরিষদের নেতা হিসেবে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করুন।
>
> পূর্ববাংলার কৃষক-শ্রমিক প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যরত পূর্ববাংলার দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক পার্টি ও ব্যক্তিদের প্রতিনিধি সম্বলিত স্বাধীন, গণতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী সরকার কায়েম করুন।

২ মার্চের হরতালের সময় পুলিশের গুলিতে দুইজন নিহত এবং কয়েকজন গুরুতর আহত হলে শেখ মুজিব ঐ দিন সন্ধ্যায় এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিন্দা প্রকাশ করেন এবং ৭ মার্চ পর্যন্ত আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেন। কর্মসূচিতে ছিল :

৩ মার্চ থেকে ৬ মার্চ (১৯৭১) পর্যন্ত প্রতিদিন সকাল ৬:০০টা থেকে বেলা ২:০০টা পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী হরতাল। ৭ মার্চ বেলা ২টায় রেসকোর্স ময়দানে জনসভা। ৩ মার্চ শেখ মুজিব ছাত্রলীগ আয়োজিত এক জনসভায় তার নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানান। ক্ষমতা হস্তান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত সকল ধরনের ট্যাক্স প্রদান বন্ধ রাখার জন্য তিনি জনগণকে নির্দেশ দেন। এমনি অবস্থায় প্রেসিডেন্ট শাসনতান্ত্রিক সংকট সমাধান করার উদ্দেশে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের পার্লামেন্টারি গ্রুপের ১২ জন নির্বাচিত সদস্যকে পরবর্তী ১০ মার্চ ঢাকায় মিলিত হবার আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগ ঐ ধরনের বৈঠকে বসতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। শেখ মুজিব ছাড়াও নূরুল আমিনসহ জামায়াতে ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (হাজারভী গ্রুপ), কনভেনশন মুসলিম লীগ ও অন্যান্য অনেকগুলো দলের নেতৃবৃন্দ বৈঠকে যোগদানে অস্বীকার করায় প্রস্তাবিত এই বৈঠক বাতিল করে দেয়া হয়।

অগত্যা ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে ২৫ মার্চ

Android Coding Bd

(১৯৭১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। ঘোষণায় তিনি বলেন:

> 'আমি এ-কথা পরিষ্কার বলে দিতে চাই যে, পরে কী ঘটবে তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী যতদিন আমার কমান্ডে আছে এবং যতদিন আমি রাষ্ট্রপ্রধান আছি ততদিন আমি পাকিস্তানের পূর্ণ সংহতি বজায় রাখব। এ ব্যাপারে কেউ যেন কোনো সন্দেহ কিংবা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে এদেশ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। দেশবাসী আমার কাছ থেকে তা আশা করে এবং আমি তাদের নিরাশ করব না।

৬ মার্চ (১৯৭১) ইয়াহিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি কঠোর প্রকৃতির সামরিক অফিসার জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। শুধু তাই নয়, আলোচনার অন্তরালে শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা শুরু করে। নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর থেকেই জাতীয় সংস্থা পি.আই.এ-তে করে বেসামরিক পোশাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে আসা হয়। সিনিয়র আর্মি অফিসার ও বড় বড় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। নগদ টাকাও ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করা হচ্ছিল। শেখ মুজিবকে আরো জানানো হয় যে, সেনাবাহিনী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অবাঙালি অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করছে। পাকবাহিনীর এই প্রস্তুতির পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবের উপর চারদিক থেকে এককভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য চাপ দেয়া হচ্ছিল। সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও সৈন্য, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস, পুলিশ সকলেই মুজিবকে গোপনে জানান যে, এ ধরনের ঘোষণা দিলে তারা মুজিবকে সমর্থন দেবেন।

৭ই মার্চের ভাষণ

এমনি প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব ৭ মার্চ (১৯৭১) রেসকোর্স ময়দানে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ (যা 'বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের' ভাষণ নামে অভিহিত হয়েছে) দেন।

উক্ত ভাষণ বিশ্লেষণ করলে আমরা শেখ মুজিবের দুটো উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি :

> এক. এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবার সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম– এই ঘোষণার মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।
>
> দুই. শেখ মুজিব তার ৭ মার্চের মাধ্যমে ইয়াহিয়া কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে চারটি পূর্বশর্ত আরোপ করেন।
>
> অবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে;
>
> অবিলম্বে সব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে;
>
> প্রাণহানি সম্পর্কে তদন্ত করতে হবে;
>
> জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর (জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বেই) করতে হবে।
>
> তিনি এই দাবিগুলো উত্থাপন করে আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই শর্তগুলো মানলে যে আওয়ামী লীগ ২৫ মার্চ আহূত

Android Coding Bd

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ দেবে– এমন কোনো নিশ্চয়তা শেখ মুজিব ভাষণে দেননি। বরং তিনি বলেছেন যে এই শর্তগুলো গ্রহণ করা হলে, 'তখন বিবেচনা করে দেখব আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না'।

৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু আন্দোলন চলতেই থাকবে বলে ঘোষণা দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, 'আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।'

৭ মার্চ ভিন্ন এক ঘোষণায় শেখ মুজিব পরবর্তী সাতদিন আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য দশ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এক স্টেটমেন্টে তিনি বলেন যে, সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত না-হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলতেই থাকবে। আন্দোলনের দশদফা কার্যক্রম ছিল নিম্নরূপ :

১. কর না-দেওয়ার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।
২. সমগ্র বাংলাদেশের সেক্রেটারিয়েট, সরকারি এবং আধা সরকারি দপ্তরগুলো, হাইকোর্ট ও অন্যান্য আদালতগুলিও ধর্মঘট পালন করবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হলে তা মাঝে মাঝে ঘোষণা করা হবে।
৩. রেল এবং বন্দরগুলি কাজ চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু যদি জনগণের দমনের উদ্দেশে ব্যবহার করা হতে পারে এমন এবং সেনাবাহিনীর চলাচলের জন্য রেল অথবা বন্দর ব্যবহার করা হয়, তাহলে রেল কর্মচারী এবং বন্দর-শ্রমিকরা সহযোগিতা করবে না।
৪. রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রগুলি আমাদের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ দেবে এবং গণআন্দোলনের সংবাদ কিছুই গোপন করবে না। এটা যদি পালন করা না হয়, তাহলে ধরা হবে যে এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মরত বাঙালিরা কোনোরকম সহযোগিতা করছে না।
৫. কেবলমাত্র স্থানীয় এবং আন্তঃজেলার মধ্যে ট্রাঙ্ক, টেলিফোন যোগাযোগ চালু থাকবে।
৬. সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৭. স্টেট ব্যাংক বা অন্যকিছুর মাধ্যমে ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পাঠাবে না।
৮. প্রতিদিন সব ভবনের উপরেই কালো পতাকা ওড়ানো হবে।
৯. অন্য সব ক্ষেত্রে ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হল, কিন্তু পরিস্থিতি বুঝে যে কোনো মুহূর্তে পূর্ণ ধর্মঘট পালনের আহ্বান ঘোষণা করা যেতে পারে।
১০. প্রতিটি ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা এবং জেলায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ ইউনিটের নেতৃত্বে একটি করে সংগ্রাম পরিষদ সংগঠন করা হবে।

অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে অন্য দল ও সংগঠনের প্রতিক্রিয়া

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ

৮ মার্চ (১৯৭১) এক সভায় মিলিত হয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সংসদ এই মর্মে প্রস্তাব করে যে :

Android Coding Bd

আগামী কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের পরিবর্তে শুধুমাত্র 'ছাত্রলীগ' নাম ব্যবহৃত হবে। প্রত্যেক জেলা শহরে হতে প্রাথমিক শাখা পর্যন্ত শাখার সভাপতিকে আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদককে সম্পাদক করিয়া এবং ৯ জন সদস্য সর্বমোট ১১ জনকে নিয়া 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে। ...দেশের সকল প্রেক্ষাগৃহে পাকিস্তানী পতাকা প্রদর্শন, পাকিস্তানী সংগীত বাজানো এবং উর্দু বই প্রদর্শন বন্ধ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে এবং বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত সিনেমা করও প্রদান না-করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি

এই দল ৯ মার্চ (১৯৭১) এক প্রচারপত্রে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহ্বান জানায়।

...নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর, সামরিক শাসন প্রত্যাহার প্রভৃতি যে দাবিগুলি আওয়ামী লীগ প্রধান উত্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি আদায় করিতে পারিলে 'স্বাধীন বাংলা' কায়েমের সংগ্রামের অগ্রগতির সুবিধা হইবে– ইহা উপলব্ধি করিয়া ঐ দাবিগুলির পিছনে কোটি কোটি জনগণকে সমবেত করা এবং ঐ দাবিগুলি পুরণে ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করা– ইহা হইল এই মুহূর্তে জরুরি কর্তব্য।

মওলানা ভাসানীর প্রচারপত্র

৯ মার্চ (১৯৭১) মওলানা ভাসানী 'পূর্ব পাকিস্তানের আজাদী রক্ষা ও মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ুন' শীর্ষক এক প্রচারপত্র প্রকাশ করেন। তিনি বলেন :

প্রিয় দেশবাসী, আজ আমি সাত কোটি পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এই জরুরি আহ্বান জানাইতে বাধ্য হচ্ছি যে, আপনারা দল, মত, ধর্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ একত্রে এবং একযোগে একটি সাধারণ কর্মসূচি গ্রহণ করুন, যার মূল লক্ষ্য হবে ২৩ বৎসরের অমানুষিক এবং শোষণকারী শাসকগোষ্ঠীর করাল কবল থেকে পূর্ববাংলাকে সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রক্ষা করা।

মওলানা ভাসানী ১০ মার্চ (১৯৭১) পল্টনের এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চের মধ্যে দাবি মেনে না নিলে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে এক হয়ে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু করবেন। উক্ত জনসভায় মওলানা ভাসানী ১৪ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

ছাত্র ইউনিয়ন

১১ মার্চ (১৯৭১) ছাত্র ইউনিয়ন এক প্রচারপত্রে শোষণমুক্ত স্বাধীন পূর্ব বাংলা কায়েমের সংগ্রাম আরও দুর্বার করে তোলার আহ্বান জানায়। ছাত্র ইউনিয়ন বর্তমানে করণীয় হিসেবে ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে :

রাজনৈতিক প্রচার অব্যাহত রাখুন; গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের মধ্যে উহা ছড়াইয়া দিন' যে-কোনোরূপ দাঙ্গা-হাঙ্গামা-উস্কানি প্রতিরোধ করুন। শান্তি-শৃঙ্খলা নিজ উদ্যোগে বজায় রাখুন। এই সংগ্রামের সফলতার জন্য সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামী শক্তির একতা গঠনের

Android Coding Bd

জোর আওয়াজ তুলুন।

পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী)

এই দল ৯ই মার্চ (১৯৭১) এক প্রচারপত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার মুক্তির জন্য শান্তি পূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন নয়, হরতাল ধর্মঘট নয়; অস্ত্র হাতে লড়াই করতে, শত শত মানুষের হত্যার বদলা নিতে এবং গ্রামে কৃষকদের গেরিলা লড়াই-এ সংগঠিত করার আহ্বান জানায়।

ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি

পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে যখন শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল, গোটা বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতার দাবির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, এমনি মুহূর্তে ১৫ মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টি প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা দেবার থিওরি ঘোষণা করেন। ভুট্টো যুক্তি দেখান যে, পাকিস্তান পিপলস পার্টি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রতিনিধি হিসেবে এই দল তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করে যেতে পারে না। ভুট্টো পাকিস্তানে 'দুই সরকার দুই প্রধানমন্ত্রী'র দাবি উত্থাপন করেন।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিক্রিয়া

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করার কারণে এবং ভুট্টোর দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের থিওরি পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সমালোচনা করেন।

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ ভুট্টোর প্রস্তাবের সমালোচনা করে বলেন, পাকিস্তানের দুই অংশে দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সরকার গঠন অবাস্তব এবং তা আইনকাঠামো আদেশের পরিপন্থী। পশ্চিম পাকিস্তান ভেঙে চারটি প্রদেশ সৃষ্টি হলেও ভুট্টো অন্যায়ভাবে এক ইউনিটের কথা বলছেন।

কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আলী আসগর শাহ বলেন যে, ভুট্টো ক্ষমতা পাবার লোভেই কেবল দুই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের দুই সরকারের কথা বলছেন। অথচ পাকিস্তান কীভাবে রক্ষা পাবে সেই চেষ্টাই তার করা উচিত ছিল।

এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা দেয়ার দাবি জানান।

ওয়ালী ন্যাপের ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করাকে অগণতান্ত্রিক ও নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেন। ওয়ালী ন্যাপ ৪ মার্চ কোয়েটায় হরতাল পালন করে।

পি.ডি.পি নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান মুজিবের দাবিগুলি ন্যায়সঙ্গত বলে মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি ঘোষণা

১৪ মার্চ (১৯৭১) শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতির মাধ্যমে এ যাবত কার্যকরী সকল নির্দেশাবলি বাতিল করে দেন। তদস্থলে ১৫ মার্চ থেকে নির্দেশ আকারে ঘোষিত

৩৫টি কার্যসূচি শুরু হবে বলে নির্দেশ দেন। Android Coding Bd

সর্বশেষ সমঝোতা অভিনয় : ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খানের ঢাকা আগমন

১৫ মার্চ কয়েকজন জেনারেলসহ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। উদ্দেশ্য শেখ মুজিবের সঙ্গে সমঝোতা করা। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক করেন।

২১ মার্চ ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। এ সময় পরিপূর্ণ একটি শাসনতন্ত্র রচনার চাইতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া নিয়েই বেশি আলোচনা করা হয়। ইয়াহিয়া খান দুই প্রদেশের দুই নেতা– ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে আপস মীমাংসা করতে ব্যর্থ হন। তিনি ভুট্টোর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া সমীচীন মনে করেননি। কারণ তখন পাঞ্জাবে ভুট্টোর ব্যাপক জনসমর্থন ছিল। তাছাড়া পাকিস্তানে সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর অধিকাংশ সদস্য পাঞ্জাব থেকে আগত। পাঞ্জাবিরা কিছুতেই ছয়দফার বাস্তবায়নে সম্মত ছিল না। আওয়ামী লীগও ছয়দফার প্রশ্নে কোনো ছাড় দিতে রাজি নয়। ইতিমধ্যে ঢাকায় ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। এমতাবস্থায় ভুট্টো ও ইয়াহিয়া খান সংকটের সামরিক সমাধান দেওয়ার পরিকল্পনা করেন। তারা শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনায় কালক্ষেপণ করে অলক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা-সদস্য ও সামরিক সরঞ্জামাদি আনয়ন করেছিল। মওদুদ আহমেদ মন্তব্য করেছেন :

ইয়াহিয়া এবং মুজিবের মধ্যে যে সমঝোতাই হউক না কেন, বাস্তব অবস্থা ছিল এই যে, ইতোমধ্যে সেনাবাহিনী তাদের সব রকম যুদ্ধোপকরণ সজ্জিত করে যুদ্ধের পূর্ণপ্রস্তুতি গ্রহণ করে নেয়। অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে এমভি সোয়াত নামের জাহাজ ৩রা মার্চ থেকেই চট্টগ্রামে নোঙরের অপেক্ষায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল। পি.আই.এ বিমানযোগে আরো ঘন ঘন ফ্লাইট-এ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বেসামরিক পোশাকে সৈন্য আমদানি করা হচ্ছিল। সৈন্য এবং যুদ্ধোপকরণ বহনকারী সি-১৩০৬ বিমানগুলো অবতরণ করছিল ঢাকা বিমানবন্দরে। স্ট্রাটেজিক পয়েন্টগুলোতে বসানো হয়েছিল ভারী কামান ও মেশিনগান। পাকিস্তানের সুকৌশলী এস.এম.জি কমান্ডো গ্রুপের ঢাকা আগমনের তথ্যও ঢাকার সাংবাদিকদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিল। মুজিব এবং ইয়াহিয়া যেখানে দেনদরবার চালাচ্ছিলেন সেই গণভবনের ভেতরে ও বাইরে মোতায়েন করা হচ্ছিল ট্যাংক বহর। অন্যদিকে যত্রতত্র জনতার উপর সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণ এবং বাঙালি-অবাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতিকে নিয়ে যাচ্ছিল আরো অবনতির দিকে।

অবশেষে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকার নিরস্ত্র জগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ইতিহাসের বর্বরতম নরহত্যা সংগঠিত করে। পাকিস্তানবাহিনী তাদের এই পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, আওয়ামী লীগ ২৬ মার্চ (১৯৭১) স্বাধীনতার ঘোষণা দিত। তাদেরকে এই কর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যই ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনী নামাতে হয়। কিন্তু এর ফল হয় উল্টো। ঢাকার নিরস্ত্র জনগণের বিরুদ্ধে পাক-সেনাবাহিনীর এই অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয়। পাকবাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১টা ১০ মিনিটে (২৬ মার্চের প্রথম

Android Coding Bd

প্রহর) শেখ মুজিবকে বন্দি করে এবং পরে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। সেখানে মিয়ানওয়ালী কারাগারে তাঁকে বন্দি করে রাখা হয়। বিদেশী পত্র-পত্রিকায় তাঁর বন্দি হওয়ার খবর প্রকাশিত হয় ১ এপ্রিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

বঙ্গবন্ধু বন্দি হওয়ার পূর্বেই চট্টগ্রামস্থ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম.এ. হান্নানের নিকট স্বাধীনতার ঘোষণা বাণী প্রেরণ করেন। বাণীটি স্বাধীনতার দলিলপত্র তৃতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (পৃ.১)। বাণীটি নিম্নরূপ :

"This may be my last message. from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is ahieved.

(বাংলা অনুবাদ) :' আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। এই আমার শেষ কথা। যে যেখানেই থাকুন না কেন সকলের প্রতি আমার আবেদন রইল, যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবিলা করুন এবং বাংলার মাটি থেকে পাক দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় না-হওয়া পর্যন্ত লড়ে যান।

২৭ মার্চ কালুরঘাটে স্থাপিত স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) থেকে মেজর জিয়াউর রহমান শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাটিও স্বাধীনতার দলিলপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে পাদটীকায় মন্তব্য করা হয়েছে যে, 'মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। মেজর জিয়া পঠিত ঘোষণাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

Major Zia, Provisional Commander-in-Chief of the Bangladesh Liberation Army. hereby proclaims, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.

> I also declare, we have already framed a soverign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and the constitution. The new democratic Government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all goverment to mobilize public opinion in their respective countries against be brutal genocide in Bangladesh.
>
> The Government under Sheikh Mujibur Rahman is sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nation of the world.'
>
> পাক সেনাবাহিনীর অঘোষিত যুদ্ধের প্রতিবাদে বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে যে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হয় তা চলে নয় মাস। অতঃপর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়ে বিজয় অর্জন করে।

Android Coding Bd

সহায়ক গ্রন্থ

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি, ১৯৫৮-১৯৭১*, ঢাকা

পাকিস্তান সরকার, *পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সম্পর্কে শ্বেতপত্র*, (৫ আগস্ট, ১৯৭১)

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম*, ঢাকা, ২০১৩

Morshed, Pakistan 1970 Elections and the Liberation of Bangladesh : A Political Analysis' *The Journal of the Institute of Bangladesh Studies*. Vol.XI (1988). pp.109-110.

Android Coding Bd